OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 402 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 402 - 409
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকাচার ও সংস্কৃতি

অনুময় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
Email ID : tintinanumoy@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Sundarbans, Folk culture, Folk belief, Ritual method, Banabibi, Worship.

Abstract
In the eighties, the emergence of Jhareswar Chattopadhyay in Bengali literature. The main field of his literature is the fringes of the Sundarbans. The people's life, culture, traditions, customs, superstitions and local gods and goddesses of this region have come up in his narratives. In fact, these customs and beliefs are intertwined with the people here. Because, in this favorable environment, they remember these worldly gods and goddesses to save them from various calamities. Naturally, Banabibi, Vishalakshi temples are established in various places of this region. Along with this, various rituals were introduced to worship these gods and goddesses. The main purpose of my essay is to show how this culture has been portrayed by Jhareswar Chattopadhyay in his literature.

Discussion

স্বাধীনতা উত্তর সময়ে নাগরিক জীবন ও সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল বাংলা কথাসাহিত্যে। সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল নাগরিক সমাজের কাছে অচেনা ও দুর্গম না হলেও তা ছিল সাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতার বৃত্তের বাইরে। তবে, আমাদের সৌভাগ্য যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু বা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা, অনুভব ও ভাবনায় ধরা পড়েছে সুন্দরবনের ভূ-প্রকৃতি, মানুষ, আর্থ-সামাজিক কাঠামো। তাঁদের উপন্যাস ও ছোটগল্পে বাদাবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী এই প্রান্তীয় ভূ-ভাগ বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় আর উপেক্ষিত ও প্রান্তবাসি হয়ে থাকল না। এরপরে সত্তরের দশকে বাংলা সাহিত্যচর্চায় যাঁরা ব্রতী হলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শচীন দাস, আব্দুল জব্বার, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা। এঁদের মধ্যে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর কথাসাহিত্যের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে সুন্দরবনের প্রান্তিক অঞ্চল ও সেখানকার মানুষের জীবনযাপন, জীবিকাকে নিয়েই। এই অঞ্চলেই তাঁর জন্ম হওয়ায় নিম্নগাঙ্গেয় বদ্বীপভূমি তথা সুন্দরবনের সঙ্গে তাঁর এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। ফলত তাঁর সাহিত্যে সেখানকার প্রকৃতি, মানুষ, তাদের সংস্কৃতি, জীবিকা সমস্ত কিছুই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কলেজ জীবন থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য রচনার প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল। সেই সময় ডায়মন্ডহারবারে একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে সাহিত্যিক শিল্পীদের মধ্যে জরাসন্ধ, বনফুল প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতেই নবীন লেখককে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য শুনে সকলেই প্রশংসা করেছিলেন। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে তিনি সেইসকল গুণী ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের কাছে বিশেষভাবে সমীহ পেতে শুরু করে। এই সময় থেকেই তাঁর অন্তরে যে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার একটা প্রচেষ্টা ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য তাঁর গল্প-উপন্যাস লেখার পিছনে দাদা সত্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণা ছিল অধিক পরিমাণে। তাঁর দাদার সঙ্গে স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের এক আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। ফলত সেই লেখকের নানা গল্প ও উপন্যাস অল্প বয়সেই লেখক ঝড়েশ্বর পড়েছিলেন। প্রফুল্ল রায়ের রচনার মধ্যে 'পূর্বপার্বতী' ও 'সিন্ধুপারের পাখি' উপন্যাস দুটি উল্লেখযোগ্য, যেগুলো লেখক অধ্যায়ন করেছিলেন। এখান থেকেই মানুষের জীবন, তাদের দারিদ্রতা, অভাব ও সমাজের নানা দিক তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন। এরপর থেকেই তিনি কয়েকটি পত্রিকায় লেখালেখির কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'ভগ্নচর', প্রথম গল্প সংকলন 'যাত্রী নিবাস'। এই গল্প লেখার প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> "গল্প প্রথম লিখি প্রতিশ্রুতি বলে একটি পত্রিকায়। সেটা ফার্ন রোড থেকে প্রকাশিত হত। কলকাতা ১৯। কিন্তু তার কলেজ স্ট্রিটে একটা অফিস ছিল। ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। ওখান থেকেই সেটি সাপ্তাহিক আকারে বের হতো। তার শারদ সংখ্যায় একটা গল্প লিখেছিলাম ভগ্নচর। ...তারপর বিভিন্ন জায়গায়—'সপ্তাহ', 'বসুমতি', 'সত্যযুগ' — রবিবারের পাতায় বেশ কিছু লেখা বেরিয়েছিল।"[১]

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় লেখালেখি শুরু করেছিলেন আশির দশকের সময় থেকেই। এই সময় সাহিত্যে বাস্তবতার আদল খুঁজতে গিয়ে বহু লেখক নিজেদের চারপাশের প্রাকৃতিক ও মনুষ্য জগতকে খুব বেশি করে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটগল্পে নতুন ধারা নিয়ে আসলেন। কিছু লেখকরা নিজেদের লেখার মর্জি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে থাকলেন। বিশেষ করে আঞ্চলিকতার বিভিন্ন দিক তাঁদের লেখার প্রেক্ষাপট হতে থাকলো। ফলত, তাঁদের সাহিত্যে সেই অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রভৃতি নানান প্রসঙ্গের সঙ্গে সেখানকার জনজাতির মুখের ভাষাও সাহিত্যের পাতায় উঠে আসতে লাগলো। এই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকরা ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাই তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলো এই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে উঠতে লাগলো। এই নিয়ে দেবেশ রায়ের একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে—

> "আশির দশকের গল্পকারদের কাছে বিষয়ের একটা আলাদা দাবি আছে। এই সময়ের গল্পের আঞ্চলিকতা অনেক বেশি বিস্তৃত, বস্তুত, আর কোনো সময়ে আঞ্চলিকতা গল্পকে এতটা প্রভাবিত করেনি। দক্ষিণের আবাদ অঞ্চল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার ঊষর প্রান্তর, উত্তরবঙ্গের অরণ্যভূমি এই সময়ের গল্পের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি একটি অঞ্চলের মধ্যেও যে উপঅঞ্চল থাকে, সেদিকেও লেখকদের দৃষ্টি গেছে।"[২]

শচীন দাশ, আব্দুল জব্বার, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার, ভগীরথ মিশ্র বাঁকুড়ার, অনিল ঘড়াই মেদিনীপুরের, অভিজিৎ সেন, দেবেশ রায় উত্তরবঙ্গের অধ্যুষিত অঞ্চলের চিত্রাঙ্গনে আত্মস্থ হয়েছেন নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতায়। এঁরা সকলেই এইসব অঞ্চলের মানুষদের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভাস ও নানান বৈচিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তাঁদের রচনায় বাস্তবটাই উঠে এসেছে অনুপুঙ্খভাবে। প্রসঙ্গত, রাঢ় ভূমির দুই দিকপাল লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই তাঁদের মাতৃভূমির আঞ্চলিক জনজীবনকে সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন। বিশেষ করে বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনা শৈলজানন্দের হাতেই ঘটেছে। প্রথমদিকে তিনি বর্ধমান জেলার আসানসোল, রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী সাঁওতাল, বাউল সম্প্রদায়ের কুলি-কামিনদের নিয়ে বহু ছোটগল্প লেখেন। এই অন্তজ মানুষদের জীবনের ছবি তুলে আনার দিকে তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 402 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তবে শুধু কয়লা খনি অঞ্চল নয়, রাঢ়ের সমতল ভূমির কথাও তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে। তাঁর ‘কয়লা কুঠির দেশ’, ‘পাতালপুরী’, ‘ষোল আনা’, ‘বানভাসি’ প্রভৃতি উপন্যাসে এই লক্ষণগুলি কমবেশি প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন—

> “শৈলজানন্দের গল্প ‘বাস্তব’ (রিয়ালিস্টিক) বলিতে যাহা বোঝায় শুধু তাহাই নয় ‘বাস্তবিক’ ও। ...স্থান-কাল-ভাষা পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরেজিতে বলে ‘লোক্যাল কালার’ তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল।”[৩]

এই আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গ থেকেই চলে আসে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা। শৈলজানন্দের মতনই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ও একটি বিশিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই তাঁর সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচনা করেছেন। প্রান্তিক সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা— সমস্ত কিছুই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। চব্বিশ পরগনা জেলায় ভূমি রাজস্ব বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন সেই অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও লোকায়ত জীবন দর্শনকে। ফলত খুব সাধারণভাবেই তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে বাদা অঞ্চলের চিরায়ত সংস্কৃতির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য একটি প্রান্তীয় জনজীবনকে সাহিত্যের পাতায় তুলে আনতে গেলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভাবধারাকেও লেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই বিষয়ের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর সচেতনতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন।

লোকসংস্কৃতি প্রাকৃত জনের অর্থাৎ ‘লোক’-এর সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি কোন অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে মানুষের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এ সবই এক লৌকিক ধারা যা স্থানীয় মানুষের দ্বারা রচিত, প্রচারিত ও প্রবাহিত হয়ে চলে। তাই লোকসংস্কৃতি বিশেষ অঞ্চলের ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ। সুন্দরবনের ভৌগোলিক-আর্থসামাজিক পরিবেশে যে জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছে, তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী যেসব আচার-প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কার তারা বংশপরম্পরায় পালন করে আসছে; সেগুলিই তাদের সংস্কৃতি। আসলে লোকসংস্কৃতি একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনের অংশ, যা তাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকায়, বিশ্বাসে, প্রাত্যহিক পূজা-পার্বণের মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিশে রয়েছে।

লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল লৌকিক দেবতা ও তার পূজার্চনা। জল-জঙ্গল অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষেরা বিপদ থেকে রক্ষার তাগিদেই লৌকিক দেবতার আরাধনা করতেন। আবার কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতেও সেই দেবতারা হয়ে উঠতেন পরম আশ্রয় স্থল। তবে এই পূজার ক্ষেত্রে কোন সাম্প্রদায়িক বাধা নিষেধ ছিল না। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এই অঞ্চলের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিত। পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন—

> “সুন্দরবন অঞ্চলের সর্বপ্রধান দেবতা বা দেবী হলেন অবশ্য বনবিবি ওরফে বিবিমা-ই। তাঁর প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন দক্ষিণ রায়। বিবিমা-দক্ষিণ রায়-শা জঙ্গলী-বড়খাঁ গাজিকে নিয়ে যেন কাহিনী গড়ে উঠেছে, তাকেই এই এলাকার নিজস্ব লোকপুরাণ বা মিথ বলে মনে করতে হয়।”[৪]

‘রামপদর অশন-ব্যসন’ উপন্যাসে সমুদ্র পার্শ্ববর্তী চরে বসবাসকারী মানুষদের কথা উঠে এসেছে। সুন্দরবন অঞ্চলের এই অনুকূল পরিবেশে জীবনযাত্রা সহজ পন্থা নয়। তা সত্ত্বেও বংশপরম্পরায় সেখানকার মানুষরা তাদের নিজস্ব জীবিকা, সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রামপদ এই আবাদ অঞ্চলে গিয়েছে ‘খড় ব্যবসার’ জন্য। সময়টা তখন মাঘের শেষ। অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে তখন জমি থেকে ধান তুলছে চাষীরা। তারপরেই সেই উৎপাদিত ফসল নিয়ে তারা নানা উৎসবে মেতে উঠবে। ঔপন্যাসিক একজায়গায় বলেছেন—

> “সামনে শিবের মাঠ। প্রতি চৈত্রে শিব ওঠে। মেলা বসে। গ্রামের লোক বলে বামুনের মাঠ।”[৫]

সুন্দরবনের লৌকিক দেবতার কথা এলে শিবের প্রসঙ্গও চলে আসে। এই অঞ্চলের মানুষেরা জঙ্গলে কাঠ, মধু সংগ্রহ করতে যাবার আগে শিবের পূজা করে। কারণ তারা মনে করে ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানকারী শিব তাদের রক্ষা করবে।

এছাড়াও কৃষিকাজের সঙ্গেও পশুপালক দেবতা শিবের কথা উঠে আসে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যেও এই কৃষক শিবের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন কাকদ্বীপের বাসিন্দা রামপদর আশ্রিতা উলপীর মা পুজো দিচ্ছে বিশালাক্ষি দেবীকে। কারণ রামপদর জীবিকা নির্বাহ হয় এই চরেই। তাকে সমুদ্র পথ দিয়ে অন্য স্থানে যেতে হয় ব্যবসার জন্য। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য মা বিশালাক্ষির প্রতি উলপীর মায়ের বিশেষ নিবেদন ফুটে ওঠে—

> "গাঙে ভাসার দিন বিশালক্ষীর থানে বাতাসা পুজো দিয়েছিল নিজের পয়সায় উলপীর মা।"[৬]

সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়, বাওয়ালী ও জলজীবীরা ত্রাণকর্ত্রীরূপে বিশালাক্ষিকে পুজো দিয়ে থাকে। বর্তমানে এই দেবী এই অঞ্চলের অনেক স্থানে রোগপ্রতিরোধকারী শক্তি রূপেও পূজিত হন। কিন্তু একটা সময় জলজঙ্গলে জীবিকা নির্বাহকারীরা তাঁর প্রধান সেবক ছিল। তবে 'সুন্দরবনের সর্বত্র নয় কাঁটাবেনিয়া, করঞ্জলি ও কাকদ্বীপে'[৭] এই দেবীর পূজা হয়। দেবব্রত নস্কর বলেছেন—

> "কাকদ্বীপে বিশালাক্ষির মন্দির তৈরির পূর্বে একটি অজানা বৃক্ষের গায়ে সিঁদুর লেপে বিশালাক্ষি নামে পূজা করা হত। বর্তমানে মন্দিরে দেবী দ্বিভুজা, শিবের উপর দণ্ডায়মানা উভয় হাতে খড়্গ। দেবীর পায়ের কাছে কাঠের সুন্দরবনের বাঘের মাথা।"[৮]

এই উপন্যাসে আটেশ্বর, দক্ষিণরায় প্রমুখ লোকদেবতার প্রসঙ্গ লেখক তুলে ধরেছেন। তবে এই অঞ্চলের প্রধান দেবী বনবিবির কথা এক বিশেষ ঘটনাক্রমে এই উপন্যাসে লক্ষ করা গিয়েছে। যারা জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে যায় সাধারণত তারা বাঘের হাত থেকে বাঁচতে বনবিবির পূজা করে। এই উপন্যাসের এক খেটে খাওয়া মানুষ ভাগ্যধর জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেলে আচমকা তাকে বাঘে আক্রমণ করে। যখন তার শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছিল দক্ষিণ রায়ের বাহন; ততক্ষণে সঙ্গী অভিরাম তার সর্ব ক্ষমতা দিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সে মা বনবিবির উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থনাও জানায়—

> "অভিরাম মানু কুড়ুল উচিয়ে বেকুব-কার গায়ে কোপ মারি গো মা! এ বড় দায় মা বনবিবি, মা বাগুলি এ দায় রক্ষা করু। জান মাঙছি - থানে যায়ে শাস্তি লুবো। জান ফিরাও- ভাগ্যর ঘরে বউ-বাচ্চা মায়ে-বেটার সংসার!"[৯]

এই উপন্যাসে অন্যত্র জায়গায়ও লেখক এই সিঁদুর মাখানো বনবিবির থান কিংবা বনবিবি পূজার কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে এই বনবিবি সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী প্রধান লোকদেবী। এই অঞ্চলের শ্বাপদ-সঙ্কুল পরিবেশে বিভিন্ন পেশার মানুষকে দেবী রক্ষা করেন। লোকবিশ্বাসে বনবিবি আর্ত মানুষের কাছে বিপদতারিণী। তাঁকে তুষ্ট করার জন্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে তাঁকে পূজা দিয়ে থাকেন।

'চরপূর্ণিমা' উপন্যাসটির পটভূমি বকখালীর অদূরে বালিস্থান নামক চরভূমি। শীতের চার মাসে এই চরভূমিতে মাছমারাদের জীবিকা নির্বাহের ছবি উঠে এসেছে। শুটকি মাছের ব্যবসাকে অন্ন সংস্থানের পন্থা করে মিন্টু দাসের মতো খটিদাররা উজান সমুদ্রে ট্রলার ভাসিয়ে দেয়। এই আড়তদারদের মঙ্গলার্থে তাদের ঘরের মা-বোনেরা গঙ্গা দেবীকে পূজা করে। গৃহ দেবদেবীর সামনে বসে ধান ও দূর্বা নিয়ে মা গঙ্গার নামে কুলো সাজায়। কুলোর চারিপাশে থাকে পান, সুপুরি, হাঁসের ডিম, চাল ভাজা, সরষের তেল, সিঁদুর প্রভৃতি নিত্য সামগ্রী। এই পুজোর উদ্দেশ্য তাদের বাড়ির পুরুষেরা যেন সুস্থভাবে পুনরায় বাড়ি ফিরে আসে কর্মক্ষেত্র থেকে। লেখক সেই মাঙ্গলিক প্রার্থনার ছবিটি তুলে ধরেন এইভাবে—

> "মিন্টু, দাসের বউ নতুন কাপড় পরে কপালে সিঁদুরের টিপে শুদ্ধ রমণী। মা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা জানায়। ট্রলারের উঁচু আহ্নিক কাঠে সন্তানের মমতায় তেল মাখায়। খালের বুকে নোনা গাঙ সমুদ্রের জল। আঁজলা ভরে তুলে চান করিয়ে দেয়। ...মা গঙ্গাকে অন্ন সমর্পণ করে অন্ন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 402 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> মাঙে এত মানুষের পেটের জন্যে। বলে, মাগো দয়া করো। বড় কষ্টে ধার দেনা করে তোমার কোলে যাচ্ছে। রক্ষা করো-কৃপা করো।"[১০]

বহুদিন থেকেই ভারতীয় সমাজে নদ-নদীকে দেব-দেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। পৌরাণিক দেবী গঙ্গাকেও নানাস্থানে নানা মাধ্যমে ভক্তরা অর্ঘ্যদান করে থাকে। হরিদ্বার থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত গঙ্গার মকর বাহন চতুর্ভূজা, সালংকারা মূর্তি লক্ষ করা যায়। আবার পৌষ মাসে কপিলমুনির আশ্রমে বহু তীর্থযাত্রীরা মা গঙ্গাকে পূজা দিতে আসেন। গঙ্গার মধ্য দিয়ে এক পবিত্র ভাবনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেখা যায়। এই উপন্যাসেও লেখক তা দেখিয়েছেন।

'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসের পটভূমি সুন্দরবনের জম্বু দ্বীপের নিকটস্থ নতুন এক দ্বীপ। এই দ্বীপে বসবাসকারী জলজীবীরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে জীবন প্রণালীর ধারা বজায় রাখে তা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। কারণ এই বিপদ-সঙ্কুল জায়গায় দৈনন্দিন খাদ্য সামগ্রী ও চাহিদা পূরণ করার জন্য তাদেরকে প্রতিনিয়তই কোন দৈবিক শক্তির উপর ভরসা রাখতে হয়। স্বাভাবিকভাবে এই দৈবিক শক্তির উৎস এখানকার বনবিবি, বিশালাক্ষী, মনসার মতন লোকদেবতারা। এই অঞ্চলের মানুষেরা সকলেই পুজো দিয়ে থাকে। জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাওয়া কিংবা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া— সমস্ত যাত্রাতেই তারা তাদের লৌকিক দেবতার উপর ভরসা রাখেন। আবার দুরারোগ্য ব্যাধিতেও উপশম দেয় এই দেবতারাই। এই উপন্যাসেও লক্ষ করা যায় তাদের প্রখর অস্তিত্বকে—

> "চাতালের ওপাশে পচা খড় ছাউনির মধ্যে দামি কাঠের জলচৌকি আকারে সিংহাসন। তেল সিঁদুর মাখানো চারখানা নুড়ি পাথর গায়ে গা লাগিয়ে সেই সিংহাসনে। প্রথম গোলাকার নুড়িটা তো বন বিবি, পরেরটা মা গঙ্গাদেবী। পাশে বিশালক্ষ্মী। শেষের নুড়ি পাথরটা মা মনসা। জল জঙ্গলে সাপ খোপ নিয়ে বসবাস।"[১১]

অনেক সময়ই সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষেরা মূর্তির পরিবর্তে নুড়ি পাথরের উপর তেল-সিঁদুর প্রলেপ দিয়ে দেবী জ্ঞানে পূজা করে। এখানে বনবিবি, বিশালাক্ষি কিংবা গঙ্গা দেবীর কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মা মনসার পুজো এখানকার মানুষেরা ভয় ও শ্রদ্ধা দুই বিপরীতমুখী ভাবনা থেকেই করে থাকে। কারণ জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকায় সাপের উৎপাত নিত্য ঘটনা। তাই কোন মানুষকে যাতে সাপ কোন ক্ষতি না করতে পারে সেই জন্য তারা মা মনসাকে শাখা, সিঁদুর, ফুল-চন্দন সহযোগে পুজো দিয়ে থাকে। নুড়ি দিয়ে পূজা করার প্রচলন প্রসঙ্গে দেবব্রত নস্কর বলেছেন—

> "মনসার নামে ঘট ও নুড়িশিলা পূজা হতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক হিন্দু পরিবারের ঠাকুর ঘরে বারোমাসই মনসার ঘট বা মনসার নুড়িশিলায় তেল সিঁদুর জল দিয়ে পূজা বা সেবা করা হয়। বিশেষত সুন্দরবন অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু পরিবারে এই সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়।"[১২]

সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের মতো প্রধান লৌকিক দেবতা ছাড়াও অন্যান্য দেব-দেবীরও আরাধনা করা হয়। বাঘের হাত থেকে রক্ষা নয়, বরং বহু রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে বহু মানুষ সেই দেবতাদের পদতলে প্রার্থনা জানায়। তাঁদের কাছে আবার 'মানত' করা হয়। এই রকমই এক দেবী হলেন ওলা বিবি। লেখকের 'সহিস' উপন্যাসে বট অশ্বত্থের নিবিড় স্থানে এই বিবিমা-এর পরিচয় পাঠক পান—

> "সাতখানা ছোট ছোট মাটির ঢিবি বসানো সাত বিবি মায়ের থান। প্রথমে মেটে ঢিবি ডেলাটা ওলাবিবি। তারপরের ছ'জন বোন, ঝোলা বিবি আজগৈবিবি চাঁদ বিবি বাহড় বিবি ঝেটুনেবিবি আর আসানবিবি। গত দিনের সিঁদুর মাখানো দাগ জেগে। এক ঘর হিন্দুর মানতের পুজোর দু-চারখানা বাসি ফুল এখনও।"[১৩]

এই ওলা বিবি হিন্দুদের পুজিত ওলাই-চন্ডী। সাধারণত কলেরা রোগের দেবী। পূজার্চনা ও গান হাজতের সহযোগে দেবীকে তুষ্ট করা হয়। তবে ওলা বিবির পূজা সর্বত্র একপ্রকার নয়। আবার বিবিমার সর্বত্র মূর্তি পূজাও হয় না। নিরাকার পূজারও প্রচলন আছে। এ প্রসঙ্গে 'চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> "চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ওলাবিবির বহু থান ও ব্যাপক গান-পূজা-হাজতের প্রচলন আছে। কাকদ্বীপ, জয়নগর, নামখানা, ধোপাগাছি, বারুইপুর, করঞ্জলি, ঘটকপুকুর, বেগমপুর, শীতলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের বহু স্থানে ওলাবিবির থান প্রত্যক্ষ করা যায়। ...ওলাবিবির থান চব্বিশ পরগণার বহু স্থানে থাকলেও, সব থানে দেবীর মূর্তিপূজার প্রচলন নেই।"[১৪]

লোকবিশ্বাসে এই বিবিরা তিন, সাত, কিংবা নয় বোন। সেইজন্য ওলা বিবিকে সপ্তমাতৃকার একজন রূপে গণ্য করা হয়। প্রতিমাসের শুক্লপক্ষে যে কোনদিন ওলা বিবির পুজো হয়। কলেরা যখন মহামারীর রূপ নেয়, তখন বিশেষ অঞ্চলের জনজাতিরা প্রাণী বলি দিয়ে এই দেবীর পূজার ব্যবস্থা করে। এই ওলা বিবির পূজা উপলক্ষে এখনও সুন্দরবনের বহু অঞ্চলে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে এই দেবী সুন্দরবনের অন্যান্য লৌকিক দেবীর মতো সর্বজনগ্রাহ্য ও অসাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করেছে। হিন্দু মুসলিম একসঙ্গেই এই দেবীর পূজাতে নৈবেদ্য প্রদান করেন।

> "নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন অঞ্চলে যেখানে পানীয় জলের সমস্যা সেখানে সাতবিবির পূজা ও মাহাত্ম্য কেন্দ্রিত পালাগান লোকশিল্পীগণ কর্তৃক গীত হয়।"[১৫]

১৯৮৬ সালে সাপ্তাহিকী বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডান দিকের সঙ্গী' গল্পে লেখক কপিল মুনির গঙ্গাসাগরের পুণ্য স্নানের প্রসঙ্গ এনেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র পূর্ণিমা তার স্বামীর অস্থি বিসর্জনের জন্য গঙ্গাসাগরে যাবে। আসলে মানুষ গঙ্গায় আসে পুণ্য লাভের জন্য। আবার অনেকের ধারণা গঙ্গাসাগরের পুণ্য তিথিতে অস্থি বিসর্জন করলে সেই ব্যক্তির মোক্ষ অর্জন হয়। হয়তো পূর্ণিমা এই ভাবনা নিয়েই সেই মহাতীর্থক্ষেত্র গঙ্গা ও সাগরের মিলনক্ষেত্র সাগরদ্বীপে যাচ্ছে। লেখক তাঁর এই গল্পে সেখানকার অসংখ্য পুণ্যার্থীদের সমাগমকে চিত্রিত করেছেন এইভাবে—

> "সামনে ধারালো হাওয়ায় জল বাড়ছে। পাশাপাশি স্নানার্থী বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল পশ্চিমি গলায় বন্দনা গায়, বলিয়ে বাবা কপিল মুনি কি? -জয়, ইন্দ্রদেও কি? -জয়, সগর রাজা কি? জয়।"[১৬]

সাগরদ্বীপের দক্ষিণে হুগলি নদী ও বঙ্গোপসাগরের সংযোগস্থল হলো গঙ্গাসাগর। হিন্দুদের কাছে যা পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কথিত আছে সাগরে স্নান করলে পুনর্জন্ম হয় না। তাই বহু তীর্থযাত্রী পৌষ সংক্রান্তির দিনে সাগরে যান। আবার পুত্র সন্তান কামনার জন্য গঙ্গাসাগর মেলাতে মা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করে সেই অঞ্চলের চাষী, জেলে মানুষরা। কৃষ্ণকালী মন্ডল এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "গঙ্গা সাগরের সঙ্গম স্নান পুণ্যফল, সর্বপাপ থেকে নিষ্কৃতির উপায় এবং মোক্ষলাভ হিসাবে আর্যশাস্ত্রগুলি নির্দেশ করে।"[১৭]

'মানচিত্রের মানুষ' গল্পে লেখক দক্ষিণের এমন এক চরভূমির কথা বলেছেন, যার 'চারিদিকে নোনাজলের ছোবল'। এখানকার মানুষদের প্রধান জীবিকা মূলত নদী, সমুদ্রে মাছ ধরা। শশধর, নীলকণ্ঠ, শ্যাম বেরার মতো দ্বীপবাসী মানুষেরা তাই প্রতিনিয়তই লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই এইসব দরিদ্র জেলা-মাঝিদের কাছে সেখানকার লৌকিক দেবদেবীরা আরো বেশি করে মান্যতা পায়। কারণ তাদের বিশ্বাস এই দেবতারা তাদের সমস্ত দুর্যোগ ও সংকট থেকে রক্ষা করবে। লেখক শশধরের জবানিতে দেবীর প্রতি কাতর আর্তি জানিয়েছেন—

> "আর চালা ঝুপড়ি না ভাঙাভাঙি হয় গো মা। ছেলেমেয়ে কটা যেন আর না ভাসে-শাসনে পড়ে, বলে দু-হাঁটু মুড়ে বন বিশালক্ষীকে গড় জানায় শশধর।"[১৮]

'বাসন্তীর পাঁচালী গানে নতুন পালা' গল্পে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ে বাসন্তী পালা গায়িকা। গ্রামে কোথাও মা শীতলার পালার আসর বসলে তাকেই বায়না করা হয়। এই পালা গেয়েই সে জীবন অতিবাহিত করে। লেখক এই গল্পে মা শীতলার মর্ত্যলোকে পূজা পাবার ঘটনা পাঠককে বলেছেন। এই দেবীর কৃপায় সমস্ত রোগ, ব্যাধি, হাম, বসন্ত থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পায়— সেই প্রসঙ্গ লেখক এনেছেন। বাসন্তীর ঠাকুর ঘরে ওলা বিবি, বনবিবির সঙ্গে এই শীতলা মায়েরও ছবি রয়েছে। যা দেখে বাসন্তী শীতলার জন্ম বৃত্তান্তের কথা আওরায়—

> "যজ্ঞ পূর্ণে নিভাইলা যজ্ঞের অনল। তাহে জন্মিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল। মস্তকে করিয়া কুলা বাহির হইলা। দেখি প্রজাপতি তারে যে শুধাইলা। কে তুমি সুন্দরী কন্যা, কাহার গৃহিণী..."[১৯]

অনেক হিন্দু পরিবারে ঠাকুর ঘরে শীতলার ঘট নিত্যদিন সিঁদুর সহযোগে অর্চনা করা হয়। যা দেবী ঘট নামে পরিচিত। এই দেবী ঘটের অজস্র প্রত্ন নিদর্শন সুন্দরবন অঞ্চলের রায়দিঘি, কঙ্কণদিঘি অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষত ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ— এই তিন মাস দেবীর পূজা হয়। কারণ এই সময় বসন্ত রোগের ব্যাপকতা দেখা যায়। এই দেবীর জন্ম প্রসঙ্গে দেবব্রত নস্কর বলেন—

> "দেবী শীতলার একটি লৌকিক পরিচয় আছে। পালাগান হতে দেবীর এই পরিচয় লাভ করা যায়। কাহিনিতে শীতলা সম্পর্কিত বক্তব্য দেবীর জন্ম নহুস রাজার যজ্ঞকুণ্ড হতে। যজ্ঞ শেষে কুণ্ডে শান্তিবারি ঢালার সময় কুণ্ড হতে দেবী মাথায় কুলো, হাতে ঝাঁটা ও কাঁখে কুম্ভ নিয়ে আবির্ভূতা হন। শীতল বারি সিঞ্চনে দেবীর উত্থান বলে ব্রহ্মা দেবীর নাম দেন শীতলা।"[২০]

'মুড়ির বার ও পালাগান' গল্পটি গ্রামে অনুষ্ঠিত হওয়া পালাগানকে কেন্দ্র করে রচিত। এই বিশিষ্ট দিনে দক্ষিণ রায় ও বিবি মায়ের পালা গানের আসরে গ্রামের সবাই মুড়ি খেয়ে থাকে আর পালার শেষে হরি ও আল্লাহ গান গায়। এ গল্পের নায়ক গৌর মন্ডল। সে এবং তার সঙ্গীরা চব্বিশ পরগনার নানা স্থানে পালাগান গায়। সেইসমস্ত গানে আল্লা, মহেশ্বর, গণেশ প্রমুখ দেবতার বন্দনাও দেওয়া হয়। গল্পকার তাঁর গল্পে সেই দিনের কথা জানান এইভাবে—

> "সারাদিনের পর উপবাসী মেয়েরা প্রথম মুড়ির গরাস গালে – তোলে। হাতের চুড়ি-শাঁখা ঠুনঠান বাজে। বড় বাড়ির বউ, গরীব বাড়ির মেয়েরা পাশাপাশি বসে মুড়ি তরকারি খায়। বিবি মায়ের সামনে পঞ্চানন থানে। মুখোমুখি।"[২১]

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় সুন্দরবনের কোন লোকদেবতা কিংবা লৌকিক আচার-প্রথা নিয়ে কোন সম্পূর্ণ উপন্যাস না লিখলেও; তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে সুন্দরবনের শাশ্বত কিছু সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন বর্তমান দিনেও সেখানকার মানুষরা কিভাবে এই সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আসলে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে তাদের প্রথা ও বিশ্বাসগুলো জড়িয়ে গিয়েছে। কারণ, সেই অনুকূল পরিবেশে বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা লৌকিক দেব-দেবীর স্মরণাপন্ন হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেই অঞ্চলের নানা জায়গায় স্থাপিত হয় বনবিবি, বিশালাক্ষির মন্দির। এই দেব-দেবীর পূজা করার জন্য বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতিও চালু হয়। কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর এই সংস্কৃতি ও লোকাচারকে খুব সাধারণ ভঙ্গিমায় তাঁর আখ্যানে তুলে ধরেছেন। যা থেকে সেই অঞ্চলের সামগ্রিক রূপও ধরা পড়েছে।

Reference:

১. সরকার, মানস, কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি, 'অন্দরমহল কথা' পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২০২৪, পৃ. ৬
২. রায়, দেবেশ, 'ছোটগল্পে আশির লেখকরাই এখন প্রধান', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ১৪
৩. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃ. ৩৪৮
৪. সেনগুপ্ত, পল্লব 'সুন্দরবনের দেবতা ও মিথ', তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, ১৪০৭,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 402 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পৃ. ৭৫
৫. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'রামপদর অশন-ব্যসন', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১২
৬. তদেব, পৃ. ১৮
৭. চৌধুরী, কমল, 'চব্বিশ পরগণা, উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৫১৫
৮. নস্কর, দেবব্রত, 'বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি', আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১২২
৯. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'রামপদর অশন-ব্যসন', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১১৭
১০. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'চরপূর্ণিমা', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৮১
১১. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'সমুদ্র দুয়ার', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫৫
১২. নস্কর, দেবব্রত, 'বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি', আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১০৬
১৩. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'সহিস', দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৫৯
১৪. নস্কর, দেবব্রত, 'চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা', ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, মে ১৯৯৯, পৃ. ৩৭৫
১৫. নস্কর, 'বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি', আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ২৩১
১৬. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'ডানদিকের সঙ্গী', শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ৫৫
১৭. মন্ডল, কৃষ্ণকালী, 'সাগরদ্বীপের অতীত: পৌরাণিক কাহিনী লৌকিক দেব-দেবী ধর্মমত ও পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান', নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত, সমকালের জিয়ন কাঠি পত্রিকা, সাগরদ্বীপের কথা বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১৯, পৃ. ৩৩
১৮. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'মানচিত্রের মানুষ', শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৮
১৯. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'বাসন্তীর পাঁচালী গানে নতুন পালা', সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১১, পৃ. ২৮৪
২০. নস্কর, দেবব্রত, 'বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি', আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১৩২
২১. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'মুড়ির বার ও পালাগান', টাওয়ারে ফাইবার ব্লেড, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩২